লন্ডনে বোমা হামলা

সন্দেহের দীর্ঘ তালিকা

লন্ডনে বোমা হামলা হয়েছে। সবাই বলছে এটি আল-কায়েদার কাজ। ঘটনাটি কী এতোটাই সরল... বিশ্লেষণ করেছেন জামান আরশাদ

হু অ্যান্ড হাউ? কীভাবে, কার এতো বড় স্পর্ধা? ব্রিটিশ গোয়েন্দারা হন্যে হয়ে এ প্রশ্নটির উত্তর খুঁজছে। কিন্তু সঠিক উত্তরটি এখনও কেউ জানে না। উত্তর ভুল হোক আর শুদ্ধ, সন্দেহের আঙুল কথিত আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী গ্রুপ আল-কায়েদা ও এর প্রধান ওসামা বিন লাদেনের দিকে।

কী শক্তিশালী এক সংগঠন আল-কায়েদা! তাদের ত্রাসে কাঁপে সারা বিশ্ব। কী ক্ষমতাবান পুরুষ এর প্রধান লাদেন। বিশ্ব যেন তার হাতের মুঠোয়। তিনি

বোমা হামলা কাঁপিয়ে দিয়েছে লন্ডন ও ব্লেয়ারকে

চাইলে সব কিছু করতে পারেন। এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, আমেরিকা-অস্ট্রেলিয়া, উত্তর মেরু, দক্ষিণ মেরু, পাহাড়-পর্বত, সাগর-মহাসাগর সবখানে তার দোর্দন্ড প্রতাপ! সব কিছু তার অধিকারে। তিনি চাইলে যেকোনো স্থানে হামলা চালাতে পারেন। কী ভয়ঙ্কর লোক তিনি! এই বিশ্বের শান্তির একমাত্র হুমকি লাদেন। তার বিনাশই সব সমস্যার সমাধান। এ ছাড়া কোনো গতি নেই। তার অনুপস্থিতিই বয়ে আনতে পারে শান্তির ফোয়ারা!

বিষয়টা যেন এ রকম। পশ্চিমারা, বিশেষ করে পশ্চিমা রাজনীতিবিদরা এ রকমই মনে করেন। আর পশ্চিমা নাগরিকদের একটি বড় অংশের মনেও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সহায়ক গণমাধ্যমগুলো এ রকম ধারণা ঢুকিয়ে দিয়েছে। তাদের মাথায় প্রাচ্য ও মুসলিমবিরোধী বীজ বুনে দিয়েছে। তাদের বিবেচনায় মুসলিম মানেই সন্ত্রাসী।

এ কারণে লন্ডনে বোমা হামলার পরপরই সব সন্দেহ আল কায়েদার দিকে। তাদের ধারণা, লাদেনের পক্ষেই এই হামলা করা সম্ভব, আর কারো পক্ষে নয়। তাদের এ ধারণায় ইন্ধন জুগিয়ে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যাক স্ট্র স্পষ্ট করে বলেছেন, কিছু লোক ইসলামের নামে এ হামলা করেছে। তবে তারা সরাসরি আল-কায়েদার নাম বলার ঝুঁকি নেননি। এরই মধ্যে কিছু সংগঠন, যারা নিজেদের আল-কায়েদার সহযোগী বলে দাবি করেছে, তারা এই হামলার দায়িত্ব স্বীকার করে ওয়েবসাইটে বিবৃতি দিয়েছে। তবে সেটা যে নেহাত কাঁচা হাতের কাজ এবং এই দাবির যে কোনো ভিত্তি নেই, তা ব্রিটিশ গোয়েন্দারা পর্যন্ত স্বীকার করেছেন।

বিশ্লেষকদের জোরালো প্রশ্ন, নিউইয়র্কে বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্রে হামলা, মাদ্রিদে ট্রেনে বোমা হামলা ও লন্ডনে বাসে-টিউবে হামলা, সব যদি আল কায়েদা করে থাকে, তাহলে তাদের ধরা হচ্ছে না কেন? এর নেতা লাদেন যদি আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে লুকিয়ে থাকেন, তাহলে তাকে কেন গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না? সেখানে তো হাজার হাজার মার্কিন সৈন্য হাজারে হাজারে কামান, টন টন বিস্ফোরক, গোলাবারুদ রয়েছে। সেখানকার সরকার মার্কিন ও ব্রিটিশ-অনুগত। এত কিছু থাকার পরেও কী তাদের পক্ষে একজন বৃদ্ধ ব্যক্তিকে ধরা সম্ভব নয়? তাকে ধরা হোক, এবং বিচারের মুখোমুখি করা হোক। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন তা করবে না। কারণ লাদেন ও আল-কায়েদাকে ধরলে তাদের ক্ষমতায় থাকার পথ বন্ধ হয়ে যায়। তথাকথিত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে অস্ত্র তৈরি ও ব্যবসার পথ বন্ধ হয়ে যায়। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মুলা ঝুলিয়ে মার্কিন অস্ত্র রপ্তানি গত ৪ বছরে কয়েক গুণ বেড়েছে, এটা নতুন কোনো খবর নয়।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, এসব বোমা হামলা পশ্চিমাদেরই কাজ হওয়া বিচিত্র নয়। তারা গোয়েন্দাদের দিয়ে হামলা করিয়ে আল-কায়েদা তথা মুসলিম বিশ্বের ওপর দোষ চাপাতে পারে। লন্ডনে বোমা হামলাও ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের কাজ হতে পারে। কারণ গোয়েন্দারা আগেই হামলার সতর্কবার্তা দিয়েছিল। তারা যদি সতর্কবার্তাই দিলো, তাহলে কেন সন্দেহভাজনদের গ্রেপ্তারের উদ্যোগ নেয়নি। সে ক্ষেত্রে গোয়েন্দাদের দ্বারাই হামলার আশঙ্কা হেসে উড়িয়ে দেয়ার সুযোগ নেই। গোয়েন্দাদের দিয়ে হামলা করিয়ে এবং হামলার পর দুর্বল মুসলিম বিশ্বকে আরো চাপে রাখার ভালোই কৌশল গ্রহণ করেছে পশ্চিমারা! পাশাপাশি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধটাও কী দারুণভাবে চালিয়ে যাচ্ছে।

এই হামলার পর রীতিমতো একটি ভীতিকর পরিবেশের মধ্যে রয়েছেন ব্রিটেনের মুসলিমরা। গণমাধ্যম মুসলিমদের সম্পর্কে জনগণকে বিরূপ ধারণা করতে শিখিয়েছে। কিছু বিভ্রান্ত পথচারী মসজিদে নামাজপড়া অবস্থায় মুসলিমদের অশ্রাব্যভাষায় গালিগালাজ করেছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে মুসলিম নেতারা পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন।

বিশ্লেষকরা বলছেন, এই হামলায় মুসলিমরা দোষী হবে কোন যুক্তিতে? ধরে নেয়া যাক, ওসামা বিন লাদেন আর আল-কায়েদা এই হামলা করেছে। তাহলেও কী মুসলিমরা দোষী হবেন? আল কায়েদা আর লাদেন কী বিশ্বের দেড়শ' কোটি মুসলমানের প্রতিনিধিত্ব করেন? আর লাদেন তো আমেরিকারই সৃষ্টি, তা কে না জানে?

তবে এই হামলার পর সরকার অভিবাসন আইন আরো কঠোর করতে যাচ্ছে। সরকার সন্ত্রাস বিরোধী আইন করতে যাচ্ছিল। এই আইনের শর্ত নিয়ে অনেক মহলে সমালোচনার ঝড় উঠেছিল। এই আইনকে মানবাধিকারবিরোধী বলেও অভিহিত করা হয়। তবে হামলার অজুহাতে এখন এই আইন পাস করতে সরকারকে আর বেগ পেতে হবে না।

জি-৮ সম্মেলন

অর্জন কম নয়

হাসান মূর্তাজা

একাধিক কারণে এবারের জি-৮ সম্মেলনটি আলোচিত। পর্যবেক্ষকরা বলছেন, গ্লেনেগ্লস সম্মেলনটি পূর্ববর্তীগুলোর চেয়ে সফল। বিশ্বায়নবিরোধীদের তৎপরতা এবারও অব্যাহত ছিল। এরই মাঝে সংস্থাটির নেতৃবৃন্দ আফ্রিকার দারিদ্র্য নিরসন ও ঋণ মওকুফের ব্যাপারে একমত হয়েছেন। জলবায়ুর পরিবর্তন রোধে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার ব্যাপারেও অগ্রগতি হয়েছে। এমনটাই দাবি জি-৮ নেতৃবৃন্দের। শেষ দিনে লন্ডনে ধারাবাহিক বোমা হামলার ঘটনা ঘটে। যা বিশ্বের শক্তিমান ৮টি দেশের এই জোটকে দাঁড় করিয়ে দেয় ভিন্ন এক বাস্তবতার মুখোমুখি। যুথবদ্ধভাবে 'সন্ত্রাস' মোকাবেলার ঘোষণা দিলেও সন্ত্রাসের প্রকৃত কারণ খুঁজে বের করার ব্যাপারে কোনা সংকল্প দেখা যায়নি নেতৃবৃন্দের মধ্যে।

জি-৮-এর ৩০ বছরের ইতিহাসে গ্লেনেগ্লস সম্মেলনকে সবচেয়ে সফল বলেছেন কানাডার টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন কার্টন। সত্তরের দশকে বিশ্বজুড়ে তেল সংকট দেখা গেলে মার্কিন, ইউরোপীয় এবং জাপানি অর্থমন্ত্রীরা অনানুষ্ঠানিকভাবে মিলিত হয়ে নিজেদের সমস্যাগুলো আলোচনা করতেন। এক পর্যায়ে দেশগুলোর নেতৃবৃন্দ এমন নিয়মিত বৈঠকে বসার সিদ্ধান্ত নেন। এভাবেই জন্ম নেয় জি-৮। শুরুতে এর সদস্য সংখ্যা ছিল ৭ : যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান, কানাডা, জার্মানি, ফ্রান্স এবং ইটালি। সংস্থাটির নাম ছিল গ্রুপ-৭। '৯৮ সালে রাশিয়াকে এতে অন্তর্ভুক্ত করা হলে নাম বদলে রাখা হয় জি-৮। প্রতিষ্ঠার পর থেকে দীর্ঘ সময় উল্লেখযোগ্য কোনো অবদান রাখতে পারেনি সংস্থাটি। বছর বছর অর্থহীন আলোচনা, গালভরা প্রতিশ্রুতি আর নিজেদের কর্তৃত্ব জাহির

বেনো এবং গেলডফ: লাইভ এইট এর উদ্যোক্তা

করাই এই ধনী দেশের ক্লাবটির অভ্যাস হয়ে গেছে। উপরন্তু, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশ্বায়নবিরোধীরা তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে আসছে জি-৮ নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে, তাদের চানক্য কূটনীতির বিরুদ্ধে। এবারও বিরোধীরা সমবেত হয়েছিলেন স্কটল্যান্ডে। এছাড়া সাবেক রক তারকা বব গেলডফ আয়োজন করেছিলেন 'লাইভ এইট' কনসার্টের। জি-৮-এর সদস্য ৮টি দেশে একসঙ্গে আয়োজিত এ যাবৎকালের সর্ববৃহৎ ওপেন এয়ার কনসার্ট। নিউইয়র্কে 'লাইভ এইট' কনসার্টে সংহতি প্রকাশ করেছিলেন জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান।

আফ্রিকার বিপুল অঙ্কের ঋণ মওকুফ এবং ৫ হাজার কোটি ডলার সাহায্যের ব্যাপারে ঐকমত্য সম্মেলনের সবচেয়ে বড় সাফল্য হিসেবে দেখা হচ্ছে। এ বছর সম্মেলনের সভাপতি ব্রিটেন। ব্লেয়ার বেশ কিছু দিন ধরে আফ্রিকায় সাহায্যের ব্যাপারে আগ্রহ দেখাচ্ছেন। এবারের আলোচ্যসূচির শীর্ষে ছিল আফ্রিকা। সাফল্য এটাই যে, ব্লেয়ার আফ্রিকার দারিদ্র্য নিরসনে বাকি ৭টি দেশের সম্মতি আদায় করেছেন। শেষ মুহূর্তে জাপান সাহায্য বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিলে সাহায্যের অঙ্ক ৫ হাজার কোটি ডলারে পৌঁছে। ব্লেয়ার বলেছেন, 'আফ্রিকার দারিদ্র্য দূর হয়েছে তা বলা যাবে না। তবে আশা করা হচ্ছে এটি দূর হবে। সবাই যা চায় তা না পাওয়া গেলেও এটি একটি অগ্রগতি- সত্যিকার এবং অর্জনযোগ্য অগ্রগতি।' এ ছাড়া জি-৮ নেতৃবৃন্দ প্যালেস্টাইনি কর্তৃপক্ষকে ৩০০ কোটি ডলার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

বৈশ্বিক উষ্ণায়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তন নিয়েও এবারের সম্মেলনে বিতর্ক হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের কিয়োটো চুক্তির বিরোধিতা সমালোচিত হয়েছে। তবে পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন, পরিবেশের পরিবর্তনের বিষয়ে প্রেসিডেন্ট বুশকে অনেক বেশি নমনীয় মনে হয়েছে এবার। বিশেষত ঘোষণাপত্রের ভাষায় একটি পরিবর্তন এসেছে, যার বিরোধিতা বুশ করেননি। প্রেসিডেন্ট বুশ বিশ্বের উত্তপ্ত হয়ে ওঠাকে বাস্তবতা হিসেবে মেনে নিয়েছেন। এও মেনেছেন যে, এ জন্য মানুষের কর্মকাণ্ডই দায়ী। কিয়োটা চুক্তিতে প্রত্যেকটি দেশের কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিরসনের কোটা বেঁধে দেয়া হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্র তা মানেনি। বরং যুক্তরাষ্ট্র এ জন্য উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে আগ্রহী। বিশ্লেষকরা আশা করছেন, জি-৮ ঘোষণাপত্রে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাক্ষর পরবর্তী জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক কনভেশনে বুশ প্রশাসনকে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নিতে উদ্বুদ্ধ করবে।

সম্মেলনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক, প্রথমবারের মতো বেসরকারি গ্রুপের অংশগ্রহণ। এবারে গ্লেনেগ্লসে পুরো পৃথিবী থেকে আগত সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন। চাপ সৃষ্টি করেছেন নেতৃবৃন্দের ওপর। এ ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছে 'মেক পোভার্টি হিস্ট্রি (Make Poverty History) আন্দোলন এবং 'লাইভ এইট' কনসার্ট। ২০০৪ সালে সি আইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট বুশ এনজিওসমূহকে সম্মেলনস্থলের বাইরে রেখেছিলেন। এবার ব্লেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন অন্য প্রতিনিধিদের যোগদানের সুযোগ দেয়ার। এছাড়া আফ্রিকার সাতটি দেশের নেতৃবৃন্দও সামিটে অংশ নিয়েছেন। এছাড়া বিশ্বের উদীয়মান পাঁচ 'বাজার' চীন, ভারত, ব্রাজিল, মেক্সিকো এবং দক্ষিণ আফ্রিকাও সম্মেলনে অংশ নিয়েছে। ভবিষ্যতে এই দেশগুলোকে বাদ দিয়ে জি-৮ সম্মেলন আবারও বসবে এমন সম্ভাবনা ক্ষীণ।

সব মিলিয়ে এবারের জি-৮ সম্মেলনকে দেখা হচ্ছে সংস্থাটির গা-ঝাড়া দিয়ে ওঠার ইঙ্গিত হিসেবে। বিশ্বের সবেচেয়ে ধনী আট দেশের দায়িত্ব অনেক। দরিদ্র দেশগুলোকে শোষণ করছে এরাই বেশি। জাতিসংঘের 'সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রা' অর্জনে সহযোগিতায় জন্য জি-৮ভুক্ত দেশগুলোকে আরো এগিয়ে আসতে হবে। বিশেষত, বিশ্বের প্রায় অর্ধেক দরিদ্রের বাসস্থল এশিয়াকে এবার উপেক্ষা করা হয়েছে। এদের বাদ রেখে জি-৮-এর পক্ষে পৃথিবী বদলে দেয়ার স্বপ্ন সফল হবে না, এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।